অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। গলার হার প্রথম যাকে পরিয়েছিলাম ..... ।।

খোলা ছাদে সন্ধ্যার পর দাঁড়িয়ে থাকা মানা তবু আজ গোধূলী পেরিয়ে একটু আঁধি রাতে ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অপ্সরা। আকাশে আজ অনেক তারা। মিটিমিটি তবু জ্বলজ্বল। এক দুই তিন ... চা ---র পাঁচ --- ধুর ছাই একটার মধ্যে আরেকটা তারা ঢুকে যাচ্ছে। তাইতো বলে আকাশের তারা গোনা যায় না যেমন বোঝা যায় না মানুষের মন। তাই কি? আচ্ছা এমন একটা মিল খুঁজতে গেলাম কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করে অপ্সরা।

কইরে অপ্সরা কোথায় গেলি তাড়াতাড়ি কর ওই দ্যাখ তোর নানু ফাল্গুনী ফাল্গুনী করতে করতে অস্থির হয়ে গেলো। দাঁড়াও মা আমি আসছি। রেডি হয়ে আছি অনেক আগ থেকেই। ছাদ থেকে চুপিসারে নেমে এসে সোজা নানুর কাছে গিয়ে নানুকে জড়িয়ে ধরে বলে – নানু তুমি রেডি? দেখি দেখি – তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। পান খেয়ে ঠোঁটটা সুন্দর লাল করেছো। রক্তলাল। হ্যাঁ রক্তলাল। একুশের রক্তলাল। উত্তর করেন নানু। নানুর গলাটা জড়িয়ে অপ্সরা বলে সত্তর বছর বয়স হয়ে গেলো নানু এখনো তুমি একুশ বললেই কেমন শিহরিত হয়ে ওঠো কেমন যেন একটা আবেগ তোমার মধ্যে। এই যে সুন্দরী অপ্সরা রহমান, আবেগ আছে বলেই তো তোর নাম ফাল্গুনী। আমার একমাত্র মেয়ের ঘরে একমাত্র নাতনী অপ্সরা রহমান ফাল্গুনী। আট ফাল্গুনকে নিজের ঘরের মধ্যে রাখতেই তো আমি তোর নাম দিয়েছি ফাল্গুনী। জানিস আপু তোর বাবা মানুষটা খুব ভালো। তুই হবার পর আমি বলেছিলাম বাবা অন্তু – আমি আমার নাতনীর নাম ফাল্গুনী রাখতে চাই। অন্তু বললো অবশ্যই। আমি জানি মা আপনি কেন ঐ নামটা চান। তাই আপনি চেয়েছেন অতএব ওর ডাক নামটা থাকবে ফাল্গুনী আর ভালো নাম অপ্সরা রহমান।

অপ্সরা – অপ্সরা – জ্বি মা! এই শোন তোর বাবা ফোন করে বললো তার ফিরতে একটু দেরী হবে তাই আমাদের যেতে হয়তো দেরী হতে পারে। তোর নানুকে উতলা হতে মানা কর। আমরা সবাই মিলেই যাবো। দেরী হলেও কোন সমস্যা নেই। আচ্ছা মা এখুনি বলছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও আমি নানুর সাথে ততক্ষণ গল্প করি। আচ্ছা নানু, তুমি অনেক আগে বলেছিলে কিন্তু এখন আর মনে নেই। কে যেন -- একজন ডাক্তার বোধহয়--- শহীদ মিনারের মানে প্রথম শহীদ মিনারের ডিজাইন করেছিলেন। তোকে বারবার এ গল্পটা করি আর তুই বারবার ভুলে যাস। তার আগে বল ছাদে একা একা কার কথা ভাবছিলি? প্রেমে পড়েছিস নাকি? হুঁম – আমি কি তোমার মত নাকি যে সব কিছুরই প্রেমে পড়ে যাই? আচ্ছা নানু মানুষের মন কি আকাশের তারাদের মত? তার মানে কি? থাক তোমার বুঝে কাজ নেই। আমার যা বোঝার তা আমি বুঝে নিয়েছি। এবার বল সে ভাগ্যবানটা কে? তা জেনে তোমার কাজ নেই। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলো।

আচ্ছা শোন্। বায়ান্নোর একুশ তারিখ। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। সকাল ১১ টায় কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, গাজীউল হকরা এলো । সমাবেশে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারে দু রকম মত হলো। কেউ ভাঙ্গবে কেউ ভাঙ্গবে না। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস এম হোসেইন এবং অন্যান্য শিক্ষকরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করলেন। ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্য্যন্ত উপস্থিত ছাত্রনেতাদের মধ্যে আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, কমরুদ্দীন শহুদ, জিল্লুর রহমান, এম আর আখতার মুকুলসহ অন্যান্য ছাত্র নেতারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত দিলেও সমাবেশ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা হচ্ছে না। এ অবস্থায় সাধারণ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের দিকে মানে আজ যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল বুঝলি, সেদিকে যেতে চেষ্টা করলো। ঠিক তখনই বেলা ৩টা ১০ মিনিটে পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি করা শুরু করলো। গুলিতে ঘটনাস্থলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্সের ছাত্র আবুল বরকত, রফিক উদ্দীন, এবং আব্দুল জব্বার নামের তিন তরুণ মারা গেলো। পরে হাসপাতালে সচিবালয়ের কর্মচারী আব্দুস সালামও মারা গেলেন। । অহিউল্লাহ নামে নয় বছরের একটি ছেলেও পুলিশের গুলিতে মারা গেলো তখন....। নানু – থাক্ এখন - এসব কথা বললে তুমি খুব ইমোশোনাল হয়ে পড়ো। নানুরে – এর মধ্যেও যে কত সুখ কত আনন্দ তোকে কি করে বোঝাই। আমার চোখ ভিজে যাক্ তবু তুই শোন্। বার বার করে এগুলো তোদের শুনতে হবে।

যাই হোক মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের সামনে যে জায়গাটায় প্রথম গুলি হয়েছিলো সেখানেই মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মিলে ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে প্রথম শহীদ মিনার তৈরী করেছিলো। শুনেছিলাম এর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন শরিয়তপুর জেলার একজন কৃতি সন্তান ডা. গোলাম মওলা। তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন ডা. মন্জুর, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. বদরুল আলম, ডা. এস ডি আহমদসহ আরো অনেক মানুষ। ডা. বদরুল আলম, পরে তিনি শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন, তো তাঁকে গোলাম মওলা ডেকে বললেন শহীদ মিনারের একটা ডিজাইন স্কেচ করে আনতে। কারণ তাঁর আঁকাআঁকির হাত ভালো ছিলো। ঘন্টা খানেকের মধ্যে বদরুল সাহেব ডিজাইন করে আনলেন। সেখানে টুকটাক পরিবর্তন এনে ১০ ফুট X ৬ ফুট মাপের প্রথম ঐতিহাসিক শহীদ মিনারের ডিজাইন ফাইনাল করা হলো। মওলা সাহেব উপস্থিত সবাইকে ডেকে বললেন স্মৃতি সৌধ তৈরী করতে হলে এখুনি ঝটপট কাজ শুরু করে দিতে হবে। সে সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন তৈরীর জন্য অনেক ইট বালি সিমেন্ট এনে রাখা ছিলো। ওগুলো নিয়েই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভোর রাত পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শহীদ মিনার তৈরী হয়ে গেলো। এর চার দিকে দড়ি টেনে ঘের দেয়া হলো। মিনারের নিচের অংশ লাল শালু দিয়ে ঘিরে উপরের অংশে হাতে লেখা দুটো পোষ্টার টাঙ্গিয়ে দেয়া হলো। একটাতে লেখা ‘শহীদ স্মৃতি অমর হোক’ আর অন্যটাতে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’।

২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ এই শহীদ মিনারে আসতে শুরু করলো। সেদিনই শহীদ শফিউর রহমানের বাবা লক্ষীবাজারের মৌলভী মাহবুবুর রহমান প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধন করলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার এর উদ্বোধন করেছিলেন দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। কেন – দ্বিতীয়বার কেন? মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ২১শের ঘটনার প্রেক্ষিতে শামসুদ্দীন সাহেব তখন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁকে সম্মানিত করার জন্য মওলানা আকরাম খাঁর নির্দেশে তাঁকে দিয়ে দ্বিতীয়বার মিনারের উদ্বোধন করানো হয়েছিলো।

তোমরা কখন গেলে? আমার মা এ ব্যপারে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে গেলো যে মেডিকেলের ছেলেরা হোষ্টেলের সামনে একটা শহীদ মিনার বানিয়েছে। মা বললো চলো দেখে আসি। তাড়াহুড়ো করে চলে গেলাম। এতো মানুষের ভীড় আমি আগে কখনো দেখিনি। ভীড় ঠেলেঠুলে যখন মিনারের কাছে গেলাম দেখলাম ফুলে ফুলে মিনার ঢেকে গেছে। আমার তখন দু চোখ দিয়ে কেবল পানি ঝরে পড়ছে। কেন? আমরা তো সঙ্গে করে কোন ফুল নিয়ে যাই নি। ব্যপারটা মাথায়ও আসেনি। আজো ভাবি ওই বয়েসে আমার এতো আবেগ কোত্থেকে এসেছিলো। আমি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে কি মনে করে নিজের গলার হারটা খুলতে লাগলাম। ভয়ে ভয়ে আড় চোখে একবার মায়ের দিকে তাকালাম। মা তাঁর অশ্রুসিক্ত চোখে আমার দিকে তকিয়ে আস্তে করে মাথাটা নিচের দিকে ঝাঁকালেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলে গলার হারখানি মিনারের পাদদেশে রেখে মা বলে এক চিৎকার দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর মা-মেয়েতে মিলে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কোন কিছুরই খেয়াল নেই আমাদের। যখন খেয়াল হলো দেখি আশপাশের সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সবার চোখে পানি। মা আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

জানিস আপু, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ট্রাকভর্তি পুলিশ এসে শাবল গাইতি দুরমুজ দিয়ে আমার মিনারটি গুঁড়িয়ে দিলো যাকে আমি আমার জীবনের প্রথম গলার হারটি পরিয়েছিলাম ..... । নানু থামো নানু কেঁদো না। এখুনি বাবা এসে যাবে। বাবা আসলেই তো আমরা মিনারে যাবো। হ্যাঁ আপু মিনারে আমরা যাবো । যেতেই হবে। যতদিন বেঁচে থাকবো মিনারে যাবো। ওই মিনারকে আমি জীবনের প্রথম গলার হার পরিয়ে ছিলাম। সেই থেকে আজ অবদি কোন ২১শে ফেব্রুয়ারী বাদ যায়নি। আমি মিনারে গেছি। তখন বয়স খুব কম ছিলো। কিন্তু যে ভালোবাসাটা বুকে জমেছিলো ওটা অনেক গভীর। অনেক বেশী। ধীরে ধীরে বড় হয়েছি। বই পুস্তক পড়ে সব জেনেছি। আজ বুঝতে পারি ওই মিনারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আমার ভাইরা আমাদের কি দিয়ে গেছে। তুই বুঝবি না আপু বুঝবি না। আমার কত শান্তি আমার প্রথম গলার হার আমি ওদেরকে দিয়েছি।

অপ্সরা --- এ্যাই অপ্সরা-- তোর বাবা এসে গেছে নানুকে নিয়ে রেডি করে চলে আয়। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। মিনারে পৌঁছতে পৌঁছতে দেড়টা বাজবে। আমরা সব বারের মতই দুটোর দিকে ফুল দিয়ে বাসায় আসতে পারবো। ... কি বললে নানু? তোর মাকে বল আমি আরো একটু বেশী

সময় থাকবো। মা নানু বলছে আরেকটু বেশী সময় থাকবে। মাকে বল মার বয়স এখন সত্তরের উপরে। চাইলেই সব কিছু করা যায় না। শুনেছো নানু তোমার মেয়ের আদেশ? হয়েছে চল তাড়াতাড়ি যাই।

কিন্তু ফাল্গুনী আপু, তুই তো আমাকে বললি না সে ভাগ্যবানটি কে? আমি যদি ভাগ্যবতী হই আজ মিনারে দেখলেও দেখতে পারি। তখন তোমাকে দেখাবো নানু কিন্তু – বুঝেছি তোর মা বাবাকে এখন বলতে পারবো না এইতো? হ্যাঁ নানু। আপাততঃ না।

(লেখাটি একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার ২০১১-র একুশে ফেব্রুয়ারীর সংকলন 'মাতৃভাষা'-য় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে – কৃতজ্ঞতা মাতৃভাষা সম্পাদক রাজন নন্দীর কাছে)